ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1635-1642
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.06W.260

স্বাধীনতা উত্তর বঙ্গীয় সমাজ সংস্কৃতি: একটি পর্যালোচনা

ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, করিমগঞ্জ কলেজ, শ্রীভূমি, আসাম, ভারত*

Received: 05.07.2025; Accepted: 25.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This chapter, titled Post-Independence Bengali Society and Culture–II, examines three major movements that significantly influenced the social and cultural landscape of Bengal after independence: the Language Movement, the Naxalite Movement, and the Hungry Generation Movement. It begins by outlining the conceptual framework of social movements—defining what constitutes a movement, how its structure and objectives are formulated, and how such movements interact with and transform society and culture.
The chapter explores the historical background, ideological foundations, and socio-political contexts that gave rise to these movements. It analyzes the Language Movement as a struggle rooted in linguistic identity and cultural assertion; the Naxalite Movement as a radical political uprising reflecting socio-economic unrest; and the Hungry Generation Movement as a literary and cultural rebellion challenging established norms.
By examining their causes, trajectories, and impacts, the chapter highlights how these movements reshaped public consciousness, political discourse, and cultural expression in post-independence Bengal. Students will gain a comprehensive understanding of the historical significance and lasting influence of these transformative movements.

Keywords: Post-independence Bengal; Language Movement; Naxalite Movement; Hungry Generation; Social movements; Cultural transformation; Political activism; Literary rebellion

মানুষ হলো সবথেকে উন্নত জীব, এমনটাই মনে করা হয়। এর পেছনে রয়েছে মানুষের যুক্তিবাদী জটিল মস্তিষ্ক। যার সাহায্যে মানুষ সেই আদি-তম সময় থেকে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে এসে পৌঁছেছে। এই চলার পথে মানুষকে অনেক প্রতিকূলতা, অনেক লড়াই, অনেক উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়েছে। তার চলার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আন্দোলন।

আন্দোলন বলতে সমাজের একটি সংগঠিত প্রচেষ্টাকে বোঝানো হয়, যেখানে নির্দিষ্ট সামাজিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানুষ একত্রিত হয়। সামাজিক আন্দোলনগুলো সাধারণত তাদের লক্ষ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়, যেমন- সংস্কারমূলক আন্দোলন (Reform Movements): নির্দিষ্ট আইন বা সামাজিক নিয়ম পরিবর্তনের চেষ্টা করে। উদারপন্থী বা মৌলিক পরিবর্তনের আন্দোলন (Radical Movements): প্রচলিত মূল্যবোধ ও কাঠামোর আমূল পরিবর্তন চায়। উদ্ভাবনী আন্দোলন (Innovation Movements): নতুন সামাজিক নিয়ম বা মূল্যবোধ প্রবর্তন করতে চায়। রক্ষণশীল

আন্দোলন (Conservative Movements): বিদ্যমান সামাজিক নিয়ম ও মূল্যবোধ রক্ষার চেষ্টা করে। আমাদের আলোচ্য তিন প্রকার আন্দোলন- **ক. ভাষা আন্দোলন খ. নকশাল আন্দোলন গ. হাংরি আন্দোলন।**

১.১: ভাষা আন্দোলন:

ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদের প্রথমেই জানতে হবে ভাষা কী। ভাষা হলো এমন একটি মাধ্যমে যার সাহায্যে মানুষ একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে, মনের ভাব প্রকাশ করে, আদান-প্রদান করে। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের মানুষ তাঁদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে থাকেন। ভাষা কী শুধুই ভাব প্রকাশ বা যোগাযোগ বা কোন বিষয় আদানপ্রদানের মাধ্যম? তা নয়। ভাষা একটি জাতির, একটি বৃহত্তর গোষ্ঠীর ইতিহাস, সংস্কৃতিকে বহন করে। তাই ভাষার গুরুত্ব অনেক।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। এই ভাষা নিয়ে অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেছেন, "আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতে বাজি খেলানো যায়, তুবড়ি ফোটান যায়, ফুল ফোটান যায়, ফুয়ারা ছোটান যায়... আমাদের মাতৃভাষা সর্বাঙ্গে রঙ্গময়ী।" এই বাংলা ভাষার জন্যই আজ সারা বিশ্বে পালিত হয়, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'।

১.১.১: বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন:

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ছিল ১৯৪০-এর শেষ ও ১৯৫০-এর শুরুর দশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম। এটি পাকিস্তান সরকারের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ ছিল, যেখানে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা করা হয়েছিল, যদিও বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় কয়েকজন ছাত্র ও কর্মী শহীদ হন, যা ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ নেয়। এই দিনটি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়, যা বিশ্বব্যাপী ভাষাগত অধিকারের জন্য দেওয়া আত্মত্যাগকে সম্মান জানায়।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হওয়ার পর পাকিস্তান দুটি ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল: পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমান পাকিস্তান)। যদিও পাকিস্তানের বেশিরভাগ জনগণ পূর্ব পাকিস্তানে বাস করত এবং বাংলায় কথা বলত, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল। এতে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে ঢাকায়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দাবি জানায় যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পাক। আন্দোলন ক্রমেই তীব্র হয়ে ওঠে, যেখানে ছাত্র, বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষ সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়। আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এবং অন্যান্য আন্দোলনকারী সরকার কর্তৃক উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও মিছিলের আয়োজন করে। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করেছিল, কিন্তু আন্দোলনকারীরা এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র শহীদ হন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার, শফিউর প্রমুখ। তাঁদের আত্মত্যাগ ২১শে ফেব্রুয়ারিকে প্রতিরোধ ও ঐক্যের প্রতীকে পরিণত করে, যা আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। ২১শে ফেব্রুয়ারির নৃশংস হত্যাকাণ্ড পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং ভাষার অধিকারের দাবিকে আরও জোড়ালো করে তোলে। শেষ পর্যন্ত, ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। এই বিজয় বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শক্তিশালী করে এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২১শে ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব শুধু বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ১৯৯৯ সালে, ইউনেস্কো দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে, যা বিশ্বব্যাপী ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে। তখন থেকে, এই দিনটি বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে, যা ভাষা আন্দোলন ও মাতৃভাষার অধিকারের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা জাতীয় পরিচয় ও স্বাধীনতার পথ সুগম করে। ২১শে ফেব্রুয়ারি কেবল স্মরণের দিন নয়, এটি ভাষা ও সাংস্কৃতিক অধিকারের শক্তির প্রতীকও। ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগ আজও বিশ্বব্যাপী ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সংরক্ষণের আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

আজও যখন ফেব্রুয়ারী মাস আসে, তখন চারদিকে উদাত্ত কণ্ঠে শোনা যায়-

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।'

সাংবাদিক ও লেখক আবদুল গাফফার চৌধুরী ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে গানটি রচনা করেন। এই গানের কথায় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি ২১ তারিখে সংঘটিত বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ফুটে উঠেছে।

কবি ও গায়ক প্রতুল মুখোপাধ্যায় বাংলাভাষাকে ভালোবেসে লিখেছেন-

'আমি বাংলায় কথা কই, আমি বাংলার কথা কই
আমি বাংলায় ভাসি, বাংলায় হাসি, বাংলায় জেগে রই
আমি বাংলায় মাতি উল্লাসে, করি বাংলায় হাহাকার
আমি সব দেখেশুনে খেপে গিয়ে-করি বাংলায় চিৎকার
বাংলা আমার দৃপ্ত স্লোগান, ক্ষিপ্ত তীর ধনুক
আমি একবার দেখি, বার বার দেখি, দেখি বাংলার মুখ।'

১.১.২: বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলন:

এই বাংলা ভাষার জন্যই বাংলাদেশের ২১শে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলনের পাশাপাশি আরেকটি ভাষা আন্দোলন উল্লেখ করা প্রয়োজন সেটি হলো আসাম রাজ্যের বাঙালি অধ্যুষিত বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলন। বাংলাদেশে ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের চেতনায় ১৯৬১ সালে ১৯ মে ভারতের আসামে বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন ১১ জন। এই ভাষা আন্দোলনে শহীদ হন, কানাইলাল নিয়োগী, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, হিতেশ বিশ্বাস, সত্যেন্দ্র দেব, কুমুদরঞ্জন দাস, সুনীল সরকার, তরণী দেবনাথ, শচীন্দ্রচন্দ্র পাল, বীরেন্দ্র সূত্রধর, সুকোমল পুরকায়স্থ এবং কমলা ভট্টাচার্য। এরপর ১৯৭২ সালের ১৭ আগস্ট সেবা সার্কুলার প্রত্যাহারের দাবিতে ভাষা আন্দোলনে শহিদ হন শ্রীভূমি জেলার বিজন চক্রবর্তী। এছাড়া ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বাংলা ভাষার দাবির আন্দোলনে শহিদ হন করিমগঞ্জের আরো দুজন, জগন্ময় দেব এবং দিব্যেন্দু দাস।

১৯৬০ সালে অসম প্রদেশ কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নেয়, গোটা রাজ্যে শুধু অসমিয়া ভাষাই সরকারি স্বীকৃতি পাবে। প্রতিবেশী পূর্ব পাকিস্তানে ৫২'র ভাষা আন্দোলনের চেতনায় সমৃদ্ধ বরাকের বাঙালিরা প্রতিবাদে শামিল হন। শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে গোটা বরাকজুড়ে শুরু হয় আন্দোলন। এই আন্দোলনকে গুরুত্ব না দিয়ে কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী বিমল প্রসাদ চালিহা ১০ অক্টোবর বিধানসভায় বিল আনেন একমাত্র অসমিয়া ভাষার সরকারি স্বীকৃতির। এর প্রতিবাদে আন্দোলনে নামলে সরকারী প্ররোচনায় পুলিশ-মিলিটারি গুলি চালালে এগারো জন সত্যাগ্রহী প্রাণ হারান। তাঁদের আত্মবলিদানকে স্মরণে রেখে ২১শে ফেব্রুয়ারীর পাশাপাশি ১৯মে ভাষা দিবস পালন করা হয়।

১.২: নকশাল আন্দোলন:

রাজনৈতিক আন্দোলন এক ধরনের সামাজিক আন্দোলন, যার লক্ষ্য রাজনৈতিক পরিবর্তন আনা। এগুলো সাধারণত সরকারী নীতিতে প্রভাব ফেলতে বা সরকার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। উদাহরণ হিসেবে 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' (Quit India Movement) উল্লেখযোগ্য, যা ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এমনই একটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন নকশাল আন্দোলন।

নকশাল আন্দোলন, যা নকশালপন্থী বা মাওবাদী বিদ্রোহ নামেও পরিচিত, ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংকট। বামপন্থী চরমপন্থার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই আন্দোলন ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে কৃষক বিদ্রোহ হিসেবে শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে ভারতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি বৃহৎ সশস্ত্র বিপ্লবে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি হলো ভূমি অধিকারের দাবি, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং আদিবাসীদের শোষণের মতো সামাজিক সমস্যা। নকশাল আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ি গ্রামে এক কৃষক বিদ্রোহের মাধ্যমে। চারু মজুমদার, কানু সান্যাল এবং জঙ্গল সান্তাল এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। এই আন্দোলনের পেছনে মাওবাদী মতাদর্শ কাজ করেছিল যেখানে সাম্যবাদী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই শুরু করা হয়।

১৯৬৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) গঠিত হলে এই আন্দোলন একটি নতুন মাত্র পায়। নকশালবাড়ি বিদ্রোহ দমন করা হলেও এর মতাদর্শ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রসহ বিভিন্ন রাজ্যে। ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে এই আন্দোলন একটি নতুন মাত্রা লাভ করে এবং বিভিন্ন নকশালপন্থী গোষ্ঠীগুলি একত্রিত হয়ে ২০০৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মাওবাদী) গঠন করে। নকশালপন্থীরা মূলত আদিবাসী, ভূমিহীন শ্রমিক এবং বঞ্চিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সমর্থন লাভ করে, যারা সরকারি অবহেলা, উচ্ছেদ এবং জমিদার ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর শোষণের শিকার ছিল। গেরিলা যুদ্ধের কৌশলে আন্দোলনকারীরা নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলা চালায় এবং সরকারি পরিকাঠামো ধংস করে।

ভারত সরকার সামরিক অভিযান এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সংমিশ্রণে এই বিদ্রোহ মোকাবিলার চেষ্টা করেছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো:

১। অপারেশন গ্রিন হান্ট (২০০৯): নকশাল গোষ্ঠীগুলোর ঘাঁটি নির্মূল করার জন্য একটি ব্যাপক আধাসামরিক অভিযান।

২। উন্নয়নমূলক উদ্যোগ: নকশাল-প্রভাবিত অঞ্চলে অবকাঠামো, কর্মসংস্থান এবং শাসনব্যবস্থা উন্নত করার জন্য সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (IAP) চালু করা।

৩। আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন নীতি: নকশালদের অস্ত্র পরিত্যাগ করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসার জন্য উৎসাহিত করা। তবে এই প্রচেষ্টাগুলি অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে দুর্গম ভূখণ্ড, বিদ্রোহীদের প্রতি স্থানীয় জনসমর্থন এবং আক্রান্ত অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থার অভাব।

নকশাল আন্দোলন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক আন্দোলন হিসেবে রয়ে গেছে। যদিও এটি দমন করা হয়েছিল, তবে আই আন্দোলনের চিন্তা-ধারা এবং প্রভাব কিছু অঞ্চলে এখনও রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে পুলিশি অভিযান কারণে নকশাল সহিংসতার মাত্রা অনেকটাই কমে এসেছে। তবে এখনো ছত্তিশগড় এবং ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যে মাঝে মাঝে হামলার ঘটনা ঘটে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে সামরিক পদক্ষেপের পাশাপাশি রাজনৈতিক সংলাপ ও সামাজিক- অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে বিদ্রোহ সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব। নকশাল আন্দোলন একটি জটিল বিষয়, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার গভীর শিকড়ে প্রোথিত। সামরিক পদক্ষেপ বিদ্রোহ দুর্বল করলেও, দারিদ্র্য, ভূমি অধিকার এবং আদিবাসী কল্যাণের মতো মূল সমস্যাগুলি সমাধান করাই দীর্ঘমেয়াদে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য।

এই নকশাল আন্দোলন নিয়ে অনেক সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছে, তৈরি হয়েছে সিনেমা। নকশাল আন্দোলন নিয়ে প্রচুর সাহিত্য রচিত হয়েছে। অরুন্ধতী রায় বুকার পুরস্কার জয়ী 'গড অব স্মল থিংস্' উপন্যাসে একটি চরিত্র নকশাল আন্দোলনে যোগ দেয়। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসে নকশাল আন্দোলন নিয়ে লিখেছেন। ১৯৯৮ সালে এ উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়, নাম ছিল 'হাজার চুরাশি কি মা'। সমরেশ মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কিন্নর রায় রচিত বেশ কিছু উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনের কথা রয়েছে।

নকশাল আন্দোলন ভিত্তিক কিছু উল্লেখযোগ্য বাংলা চলচ্চিত্র:

- প্রতিদ্বন্দ্বী (১৯৭০) – সত্যজিৎ রায়ের পরিচালিত এই চলচ্চিত্রটি বেকার যুবকদের সংগ্রাম এবং নকশাল আন্দোলনের প্রভাবকে তুলে ধরে।
- কলকাতা '৭১ (১৯৭২) – মৃণাল সেন পরিচালিত এই চলচ্চিত্রটি নকশাল আন্দোলন এবং তার তরুণ প্রজন্মের উপর প্রভাব নিয়ে নির্মিত।
- পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৯৩) – গৌতম ঘোষ পরিচালিত এই চলচ্চিত্রটি বাংলার নকশাল আন্দোলনের প্রসঙ্গ ছুঁয়ে যায়।
- লাল দরজা (১৯৯৭) – বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত পরিচালিত এই চলচ্চিত্রটি নকশাল আন্দোলনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জীবন কাহিনি তুলে ধরে।

নকশাল আন্দোলন নিয়ে নির্মিত অন্যান্য ভারতীয় চলচ্চিত্র:

- দ্য নকশালাইটস (১৯৮০)– কেএ আব্বাস পরিচালিত হিন্দি চলচ্চিত্র, যেখানে মিঠুন চক্রবর্তী অভিনয় করেছেন।
- আঁধি গলি (১৯৮৪)– ১৯৭০-এর দশকের নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে নির্মিত একটি বলিউড চলচ্চিত্র।
- লাল সালাম (২০০২)– নন্দিতা দাস, শরদ কাপুর, এবং বিজয় রাজ অভিনীত একটি কম পরিচিত অ্যাকশন-ড্রামা।
- হাজারো খোয়াইশে অ্যায়সি (২০০৫)– ১৯৭০-এর দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নির্মিত চলচ্চিত্র, যেখানে কেকে মেনন, চিত্রাঙ্গদা সিং এবং শাইনি আহুজা অভিনয় করেছেন।

- চামকু (২০০৮)– বিহারে নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে নির্মিত একটি অ্যাকশন থ্রিলার, যেখানে ববি দেওল, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, এবং ইরফান খান অভিনয় করেছেন।
- রেড অ্যালার্ট: দ্য ওয়ার উইদিন (২০১০)– আনন্ত মহাদেবন পরিচালিত, বাস্তব কাহিনির ওপর ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্র, যেখানে সুনীল শেট্টি, সমীরা রেড্ডি, এবং আশীষ বিদ্যার্থী অভিনয় করেছেন।
- চক্রব্যূহ (২০১২)– পুলিশ ও মাওবাদীদের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষ নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র, যেখানে অর্জুন রামপাল, অভয় দেওল, এবং মনোজ বাজপেয়ী অভিনয় করেছেন।
- নিউটন (২০১৭)– রাজকুমার রাও অভিনীত একটি ব্ল্যাক কমেডি ড্রামা, যেখানে একজন নতুন সরকারি কর্মকর্তা নকশাল-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব পায়।
- বীরাট পর্বম (২০২২)– ১৯৯০-এর দশকের তেলেঙ্গানার নকশাল আন্দোলনের সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত একটি তেলেগু চলচ্চিত্র, যেখানে রানা দাগ্গুবাতি ও সাই পল্লবী অভিনয় করেছেন।

১.৩: হাংরি আন্দোলন:

হাংরি আন্দোলন একটি সাহিত্যিক আন্দোলন। যা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তুমুল সাড়া জাগিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে হাংরি আন্দোলনের লেখকরা যা কিছু প্রাতিষ্ঠানিক, সে-সবকে সমূলে তুলে ফেলতে চেয়েছিলেন। এই আন্দোলন শুরু হয় ১৯৬৩-১৯৬৪ এর দিকে। সাহিত্যের ইতিহাসে জায়গা করে নেওয়া এই আন্দোলন সাহিত্য চিন্তা, ভাবনা, শব্দ ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজের স্বকীয়তা নিয়ে হাজির হয়, এবং সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত লেখকরা কোনরকম ফর্মকে সামনে রেখে লেখেননি, কোন দর্শনকে ভেবেও লেখেননি। জীবন তাঁদের যা দেখিয়েছে, শিখিয়েছে তাকেই তাঁরা তুলে এনেছেন লেখায়। জীবন মন্থিত এইসব লেখায় তাই রূক্ষতা লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে।

যে পাঁচ জন হাংরি জেনারেশন আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাঁরা হলেন, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য এবং শৈলেশ্বর ঘোষ। হাংরি আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য কবি, শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য, সমীর রায়চৌধুরী, মলয় রায় চৌধুরী, ফাল্গুনী রায়, দেবী রায়, উৎপল কুমার বসু, সুবিমল বসাক, ত্রিদিব মিত্র, রবিউল হুসাইন, অরুণেশ ঘোষ। কথাসাহিত্যিক হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ, সুবিমল বসাক, প্রমুখের নাম। নাটকের ক্ষেত্রে মলয় রায় চৌধুরী, ফাল্গুনী রায়ের কথা উল্লেখ করা যায়।

হাংরি জেনারেশন (অথবা হাংরিয়ালিস্ট আন্দোলন) ১৯৬০-এর দশকে ভারতের বিশেষত বাংলার একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল। এটি একদল বিদ্রোহী কবি, লেখক ও শিল্পীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে, যারা প্রচলিত সাহিত্যিক রীতিনীতিকে প্রত্যাখ্যান করে এক নতুন, কাঁচা, বিদ্রোহী ও আধুনিকতাবাদী (অ্যাভান্ট-গার্ড) প্রকাশভঙ্গি তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এই আন্দোলন শুরু হয় ১৯৬১ সালে কলকাতায়। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মলয় রায় চৌধুরী, সমীর রায় চৌধুরী, সুবিমল বসাক ও দেবী রায়। এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক আধুনিকতাবাদী সাহিত্যধারার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল, বিশেষ করে আমেরিকার বিট জেনারেশন এবং ইউরোপের দাদাবাদ ও অতিবাস্তববাদী (সুররিয়ালিস্ট) আন্দোলন। হাংরি লেখকরা মূলধারার প্রথাগত ও অভিজাত বাংলা সাহিত্যকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাদের রচনায় তুলে ধরেন ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অস্তিত্বের সংকট, বিদ্রোহ ও সামাজিক অবিচার। তাঁদের সাহিত্যচর্চা ছিল ইচ্ছাকৃতভাবে রূঢ়, ধাক্কা দেওয়ার মতো, এবং প্রচলিত কাঠামো ও ভাষা ভেঙে দেওয়া।

হাংরি জেনারেশনের সাহিত্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-পরবর্তী অস্থির সময়ের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল। তাঁদের লেখায় উঠে আসে—

- অর্থনৈতিক বৈষম্য– শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের প্রতিফলন
- বিচ্ছিন্নতা ও হতাশা– অস্তিত্বের সংকট ও মোহভঙ্গের চিত্র
- যৌন স্বচ্ছন্দতা– যৌনতা ও দেহতৃষ্ণা নিয়ে ট্যাবু ভাঙা আলোচনা
- নগরজীবনের বিশৃঙ্খলা– পরিবর্তনশীল শহুরে জীবনের অরাজকতা
- বিদ্রোহ– প্রচলিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ধারা প্রত্যাখ্যান

তাদের ভাষা ছিল ইচ্ছাকৃতভাবে অমার্জিত, যেখানে বাংলা ভাষার সঙ্গে স্ল্যাং, অসম্পূর্ণ বাক্য ও গালি-গালাজ পর্যন্ত মেশানো হতো, যা প্রচলিত শুদ্ধ ও গঠনমূলক সাহিত্যের বিপরীত ছিল। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে-

১. “ক্ষিপ্রহাত, ছিন্নমুন্ড, কয়েক ঝলক রক্ত, লক লকে জিভ
উল্লোল স্ফুরিত হিংস্র সারি সারি ভীষণ জল্লাদ.....
‘খচ’, করে শব্দ এক, আমার কর্তিত দেহ, দেখি
ছটফট করিতেছে মেঝের উপর গর্তে! “কেমন বল্লম শালা
জেদে গোঁয়ারতুমি করিসনে, শিল্প-ফিল্প গ্যাঁড়াকল বহুদিন শেষ হয়ে গেছে”

(মেঘনাদের পুনরুজ্জীবন, মলয় রায় চৌধুরী)

২. “হলুদ পাতা ঝরে পড়ে, আকাশের জলে শুকনো মাটি হয় কাদা
তবে সব কিছু শেষ হয়নি পৃথিবীতে! নাও ঘ্রাণ... ওই উন্মোচিত স্তন...
শিকারীর গন্ধ দূর থেকে পায় পশুরা....”

(সরস্বতী, শৈলেশ্বর ঘোষ)

৩. কবি প্রদীপ চৌধুরী লীনা নামক তাঁর নারীকে বলেছেন-

“এখন তোমার মুখে আদিম জ্যোৎস্না
ফোটে কাছাকাছি হ্রদতট ও খাদ
জ্যোৎস্নায় শুকিয়ে যাচ্ছে আমাদের বিরহ ও যৌন কোলাহল”

(বিধ্বস্ত উপজাতি, প্রদীপ চৌধুরী)

৪. প্রেম যখন রিরংসা ও ঘৃণার অর্থহীনতায় অলংকৃত হয়, তখন শোনা যায় কবির উচ্চারণ-

“গণিকার বাথরুম থেকে প্রেমিকার বিছানার দিকে
আমার অনায়াস যাতায়াত শেষ হয় নাই”

(আমি ও সৌন্দর্য রাক্ষস, ফাল্গুনী রায়)

এই আন্দোলন তৎকালীন মূলধারার সাহিত্যিক সমাজ এবং সরকারের প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে পড়ে। অনেক লেখা অশ্লীল ও রাষ্ট্রবিরোধী বলে বিবেচিত হয়, যার ফলে পুলিশের হানা, নিষেধাজ্ঞা ও লেখকদের কারাবরণ পর্যন্ত ঘটে। বিশেষত মলয় রায় চৌধুরীর বিখ্যাত কবিতা “স্টার্ক ইলেকট্রিক জিসাস” অত্যন্ত বিতর্কিত হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে তিনি অশ্লীলতার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন, যদিও পরবর্তীতে তিনি মুক্তি পান।

যদিও হাংরি জেনারেশন আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, তবে এটি আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। এই আন্দোলনের হাত ধরে ভারতের সাহিত্য আরও পরীক্ষামূলক ও বিদ্রোহী ধারায় প্রবাহিত হয়।

পরবর্তী সময়ে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন ও নকশালপন্থী সাহিত্য আন্দোলন-এর অনেক লেখক হাংরি লেখকদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে এই আন্দোলন ক্ষীণ হয়ে এলেও এর বিদ্রোহী চেতনা ও শিল্পের স্বাধীনতার লড়াই আজও বহু কবি-লেখকের সৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। বিশ্বাস, সুকুমার। আসামে ভাষা আন্দোলন ও বাঙালি-প্রসঙ্গ ১৯৪৭-১৯৬১। পারুল প্রকাশনী পাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ২০১৭।

২। ঘোষ, নির্মল কুমার। নকশাল আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯।

৩। কামাল মোস্তাফা। ভাষা আন্দোলন: সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭।

৪। হক, মুহাম্মদ লুৎফুল। ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্ব (১৯৪৭-৪৮), কবি প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ২০২৩।

৫। সেন, সব্যসাচী। শৈলেশ্বর ঘোষ রচনা সমগ্র, লিইবার ফিয়েরা, কলকাতা।

৬। দে, কুমার বিষ্ণু। হাংরি আন্দোলন ও দ্রোহপুরুষ কথা, সহযাত্রী, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১৩।

৭। পুরকায়স্থ রণবীর। উনিশে মে ভাষার সংকট, একুশ শতক, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০২১।

৮। Dasgupta, Subhoranjan. People, Politics and Protests V, The Creative& Cultural Dimension of the Naxalbari Movement, Published by Mahanirban Calcutta Research Group, Kolkata 700106, December 2017.